প্রাচীন কালের ভারতীয় দর্শন : একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

সুব্রত গৌড়ী

প্রথম প্রশ্ন হল, দর্শন বলতে কী বোঝায়? দর্শন শব্দের অর্থ দেখা। এই দেখা বলতে শুধু চোখ দিয়ে দেখা বোঝায় না। এই দেখার অর্থ পর্যবেক্ষণ। অর্থাৎ মানুষ তার পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে যা প্রত্যক্ষ করে, তাকে যখন সুসংবদ্ধ ভাষায় তত্ত্বের আকারে প্রকাশ করতে পারে, তাকেই আমরা বলি দর্শন। বাস্তব জগৎ, সমাজ বা আমাদের মননক্রিয়া সম্পর্কে আমাদের সকলের ধারণা এক হয় না, একই বিষয় সম্পর্কে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়, এমনকি পরস্পরবিরোধী চিন্তার প্রকাশ ঘটতেও দেখা যায়। তাই দর্শনের সাথে দৃষ্টিভঙ্গির ওতপ্রোত সম্পর্ক আছে।

যেহেতু আমাদের চিন্তার পরিমণ্ডল বস্তু ও ভাবের সমন্বয়ের ভিত্তিতে তৈরি হয়,তাই বিভিন্ন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে বস্তু ও ভাবের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে। যে সমস্ত দার্শনিক মতবাদ মনে করে যে, বস্তু প্রায়র, অর্থাৎ বস্তু আদি, বস্তু থেকেই ভাবের সৃষ্টি, তাদের বলা হয় বস্তুবাদী দর্শন। আর যে সমস্ত দার্শনিক মতবাদ মনে করে যে, ভাবই প্রায়র, অর্থাৎ, ভাবই আদি, ভাব থেকেই বস্তুর উৎপত্তি, তাদের বলা হয় ভাববাদী দর্শন। কোনও কোনও ভাববাদী দর্শন বস্তুর অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে।

আরেকটা বিষয়ও উল্লেখ করা দরকার যে, মানব সমাজের বিকাশের প্রাথমিক পর্বে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত মানুষ চিন্তা করেছে, কিন্তু দার্শনিক মতবাদের আকারে তাকে প্রকাশ করতে পারেনি। সেই সময় তার চিন্তা ছিল বস্তুতান্ত্রিক। বস্তু বহির্ভূত কোনও সত্তার অস্তিত্বের কল্পনা করবার মতো বাস্তব পরিবেশ পরিস্থিতির উদ্ভব তখন হয়নি।

দার্শনিক মতবাদের আকারে মানুষ তার চিন্তাকে প্রকাশ করতে পারল সমাজ শ্রেণি বিভক্ত হওয়ার পরে। শ্রেণি বিভাজনের পরেই শ্রম বিভাজন স্পষ্টরূপে দেখা দিল, হাতেকলমে কাজ ও চিন্তা করার কাজের মধ্যে এই শ্রমবিভাজন রূপ পেল। উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ এমন একটা স্তরে পৌছাল, যাতে জীবনধারণের উপকরণ সংগ্রহের কাজ থেকে কিছু মানুষকে ছেড়ে দেওয়া সম্ভব হল। ফলে, সমাজে একদল মানুষের পক্ষে তার চারপাশের জগতে যা ঘটছে, তার কারণ অনুসন্ধানের কাজে নিযুক্ত থাকা সম্ভব হল। তাই এই সময় থেকেই বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের উদ্ভব হতে দেখা যায়।

ভারতবর্ষে দর্শনচর্চার সূচনা

ভারতীয় ভূখণ্ডের মানবসমাজের লিখিত ইতিহাস সংরক্ষিত আছে বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে। আমরা জানি, আর্যরা ভারতে পদার্পণ করার প্রায় দেড় হাজার বছর আগে সিন্ধু নদীর অববাহিকায় একটি উন্নত সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, আর্যরা আসার আগেই যার অবক্ষয় শুরু হয়েছিল এবং কালক্রমে ধ্বংস হয়েছিল। কিন্তু সেই সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রাপ্ত শিলালিপির পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তাই সেই সমাজের দর্শনচিন্তা সম্পর্কে আমাদের জানা নেই।

তাই বৈদিক সভ্যতার ক্রমবিকাশের পথে কীভাবে দর্শনের উদ্ভব হয়েছিল, সেই বিষয়টি আমরা আলোচনা করব। বৈদিক যুগের ব্যাপ্তি প্রায় এক হাজার বছর। তাই এটা বুঝতে অসুবিধা হয়না যে, এই এক হাজার বছরে মানুষের চিন্তা এক জায়গায় বসে থাকে নি, সমাজ বিকাশের সাথে সাথে চিন্তারও বিকাশ ঘটেছে।

বেদের প্রথম দিকে বিশেষ করে ঋগ্বেদ সংহিতা রচনার সময়কালে মানুষের চিন্তা ছিল বস্তুতান্ত্রিক। অর্থাৎ তখন মানুষের চিন্তা বস্তুকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হত, বস্তু বহির্ভূত কোনও চিন্তা উদ্ভবের বাস্তব পরিবেশই তখন সৃষ্টি হয় নি। তাই ঋগ্বেদ সংহিতার শ্লোকগুলিতে আমরা দেখি যে, আদি

পর্যায়ের কবিদের অন্নচিন্তাই যেন পরম চিন্তা ছিল, তত্ত্ব জিজ্ঞাসা তাদের রচনার বৈশিষ্ট্য ছিল না। তাই সমগ্র ঋগ্বেদ জুড়ে কয়েকটি পার্থিব কামনার অন্তহীন পুনরুক্তি দেখা যায়, অন্নের কামনা, পশুর কামনা, সন্তানের কামনা ইত্যাদি। কিন্তু তখনও কোনও দার্শনিক মতবাদের উদ্ভব হয় নি। পরবর্তীকালে উপনিষদে অধ্যাত্মবাদী দর্শনে যে মোক্ষ কামনা পরমপ্রাপ্তি বলে স্বীকৃত, ঋগ্বেদে তা পাওয়া যায় না। সেই সময়কার সমাজ কাঠামো বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় তখনও সমাজে শ্রেণি বিভাজন পাকাপোক্ত হয়নি। তাই তখন বৃত্তি অবলম্বনের ব্যাপারে কোনও বাধ্যবাধকতা ছিল না। চিন্তা ও কর্মের মধ্যে শ্রমবিভাজন স্থায়ী রূপ ধারণ করেনি।

পরবর্তীকালে, অর্থাৎ বৈদিক যুগের শেষ পর্যায়ে, বিশেষত, উপনিষদের যুগে সমাজে শ্রেণি বিভাজন পাকাপোক্ত হয়ে গেল, জাতিভেদ প্রথা প্রবল আকার ধারণ করল। জাতি ও বৃত্তি নির্ধারণ হত বংশ পরিচয় দিয়ে। কেবলমাত্র উচ্চবর্ণের পুরুষরাই বিদ্যাচর্চার অধিকার লাভ করত এবং বিভিন্ন কারিগরি বৃত্তিগুলি নীচ বলে পরিগণিত হত। ফলে চিন্তা ও কর্মের মধ্যে শ্রমবিভাজন স্পষ্টরূপে দেখা দিল। এই প্রেক্ষাপটেই ভারতে দর্শনচিন্তার উদ্ভব। তাই উপনিষদে দার্শনিক মতবাদের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথম যে দার্শনিকের কথা বলতে হয়, তিনি হলেন যাজ্ঞবল্ক্য। তিনি ছিলেন ভাববাদী দার্শনিক। তিনিই হলেন ভারতে ভাববাদের প্রথম প্রবক্তা। আবার উপনিষদে বস্তুবাদী দার্শনিক মতবাদের সন্ধানও পাওয়া যায়। অতীতের বস্তুতান্ত্রিক চিন্তার ধারাবাহিকতায় বস্তুবাদী দার্শনিক মতেরও উদ্ভব হয়েছিল। যেমন, ছান্দোগ্য উপনিষদে উদ্দালক আরুনির যে বক্তব্য পাওয়া যায়, তা বস্তুবাদী দর্শনকেই প্রতিফলিত করেছে। অন্যান্য নানা দার্শনিক মতের মতোই ছান্দোগ্য উপনিষদে উদ্দালকের বক্তব্যটি একটি আখ্যানের রূপে প্রকাশিত। ছেলে শ্বেতকেতুকে উপদেশ দেবার আখ্যান। উপদেশের মূল কথা হল, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি কারণকে 'নিছক সৎ' বলেই উল্লেখ করতে হবে। এই সৎ থেকে পর্যায়ক্রমে আগুন, জল এবং অন্নের উৎপত্তি। আগুনের সূক্ষ্মতম অংশ থেকে বাক, জলের সূক্ষ্মতম অংশ থেকে প্রাণ এবং অন্নের সুক্ষ্মতম অংশ থেকে মন তৈরি হয়। শেষ কথাটা অর্থাৎ নিছক অন্ন থেকে কী ভাবে মন উৎপন্ন হতে পারে সে বিষয়ে শ্বেতকেতু উদ্দালককে একটু বিস্তৃত ব্যাখ্যার অনুরোধ জানালেন। ব্যাখ্যা হিসেবে উদ্দালক একটা পরীক্ষা করে কথাটার প্রমাণ দিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে পরীক্ষামূলকভাবে কোনও বিষয় প্রমাণ করবার এটাই সম্ভবত প্রাচীনতম নিদর্শন। ছেলেকে তিনি বললেন, ১৫ দিন অন্ন ভক্ষণ বন্ধ রাখো। কিন্তু জল পান করো। জল থেকে প্রাণের উৎপত্তি বলে এই ১৫ দিন জল পান করলে প্রাণ সংশয় হবে না। ছেলে ১৫ দিন অন্ন ভক্ষণ বন্ধ রাখলেন। কিন্তু জল পান করে প্রাণ রক্ষা করলেন। তারপর উদ্দালক বললেন, বারো বছর ধরে গুরুর কাছে যে বেদ মুখস্থ করেছো তা আবৃত্তি করে শোনাও। শ্বেতকেতু চেষ্টা করেও বিফল হলেন। বললেন, কিছুই মনে পড়ছে না। পিতা বললেন, অন্ন থেকেই মনের উৎপত্তি। ১৫ দিন কিছু খাওনি বলে তোমার মনের এই অবস্থা। এবার ফিরে গিয়ে ১৫ দিন ধরে খাওয়া দাওয়া করে আবার এসো। শ্বেতকেতু তাই করলেন। উদ্দালক বললেন, এবার বেদ মুখস্থ করে শোনাও। এবার দেখা গেল, শ্বেতকেতুর বেদ মনে পড়ছে, আবৃত্তি করতে কোনও অসুবিধা হল না। উদ্দালক বললেন, তাহলে তো দেখতেই পাচ্ছ, অন্ন থেকেই মনের উৎপত্তি।

ভারতীয় দর্শনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য

পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাগুলির মধ্যে ভারতীয় সভ্যতা অন্যতম। তাই ভারতবর্ষের দার্শনিক মতবাদের একটা দীর্ঘ ঐতিহ্য আছে এবং তার নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্যও আছে। ইউরোপের ইতিহাসে যে ভাবে বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের বিকাশ হয়েছে, তার থেকে ভারতীয় দর্শনের বিকাশের ইতিহাস আলাদা। মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে সেই বিষয়টি প্রথমে রাখছি।

ইউরোপে দর্শনচিন্তার বিকাশের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, একেকটা বিশেষ যুগে যে দার্শনিকদের আবির্ভাব ঘটেছে, তাঁরা তাঁদের পূর্বসূরিদের চিন্তাকে যুক্তি সহকারে নস্যাৎ করেছেন এবং নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে নতুন নতুন দার্শনিক মতবাদের জন্ম দিয়েছেন। তাঁরা কেউই তাঁদের পূর্বসূরিদের চিন্তা প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্য নিয়ে দর্শন চর্চা করেননি।

এর বিপরীতে এ দেশে যত ধরনের দার্শনিক মতবাদের সন্ধান পাওয়া গেছে, তাদের প্রায় সকলেরই চিন্তার মূল উপাদান প্রাচীনকালের কোনও না কোনও দার্শনিক মতবাদের মধ্যে পাওয়া যায়। সেই প্রাথমিক চিন্তার ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়েই বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের পরিণত রূপটি তৈরি হয়েছে। বিশেষ বিশেষ দার্শনিক মতবাদের বাহক হিসাবে একের পর এক দার্শনিক এসেছেন, তাঁদের মধ্যে অনেক সমৃদ্ধ চিন্তার অধিকারী দার্শনিকও এসেছেন, কিন্তু সম্পূর্ণ নতুন কোনও দার্শনিক মতবাদের জন্ম দিয়েছেন, এরকম সাধারণত ঘটেনি। বরং প্রত্যেকেই তাঁদের পূর্বসূরিদের অবস্থানকে সমর্থন করেছেন এবং তার পক্ষে নতুন যুক্তির অবতারণা করেছেন।

সংক্ষেপে বলা যায়, এ দেশে বহু প্রাচীনকাল থেকেই একই সাথে বেশ কিছু দার্শনিক মতবাদ সমান্তরালভাবে বিকশিত হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, বহু প্রাচীনকাল থেকেই এখানে নানা দার্শনিক মতবাদের বিকাশ ঘটেছে পরস্পরের মধ্যে মতবাদিক সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে। কোনও দর্শনই এদেশে অন্যান্য দর্শন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিকশিত হয়নি। বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের সঙ্গে যুক্ত সূত্রগ্রন্থগুলি বিচার বিশ্লেষণ করলে স্পষ্টই দেখা যায় যে, এরা পরস্পরের মতবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে এবং অন্যদের মতবাদ বাতিল করে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের চেষ্টা করেছে।

আমাদের দেশের দার্শনিক গ্রন্থগুলির বৈশিষ্ট্য হল, প্রত্যেকেই তার বিরোধী মতকে বিচার বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বাতিল করে নিজের মতকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। দার্শনিকেরা তাঁদের নিজেদের মতের বিরুদ্ধে বিরোধীরা যা যা বলতে পারেন, প্রথমে তা উত্থাপন করেন। একে বলা হয় পূর্বপক্ষ। এরপর পূর্বপক্ষকে ভুল প্রমাণিত করার চেষ্টা করেন। তারপরেই কেবল নিজের মত ব্যাখ্যা করেন এবং তার যথার্থতা প্রতিষ্ঠা করেন। একে বলে সিদ্ধান্ত।

তৃতীয়ত, আমরা জানি, বস্তুবাদের বিরুদ্ধে ভাববাদের বৈরীতা সর্বজনীন। পৃথিবীর সর্বত্রই একে অপরকে তুচ্ছ প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু ভারতবর্ষের মতো আর কোথাও বস্তুবাদী দর্শনের পুঁথিপত্র ধ্বংস করা হয়নি। তাই আমরা দেখি, চরম বস্তুবাদী দর্শন লোকায়তর কোনও নিজস্ব পুঁথি পাওয়া যায় না।

শুধু তাই নয়, বস্তুবাদী দর্শনকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য ভাববাদকে দেবতাদের এবং বস্তুবাদকে অসুরদের দর্শন হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ভারতীয় দার্শনিক ঐতিহ্যে আস্তিক্য ও নাস্তিক্য

আস্তিক ও নাস্তিক শব্দ দুটি সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয় ঈশ্বরে বিশ্বাস কিংবা অবিশ্বাসের দৃষ্টিভঙ্গিকে ভিত্তি করে। যারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী, তাদের বলা হয় আস্তিক এবং যারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়, তাদের বলা হয় নাস্তিক।

কিন্তু ভারতীয় দার্শনিক ঐতিহ্যে শব্দ দুটির ব্যবহার ভিন্নভাবে হয়। আস্তিক কথাটির অর্থ বেদ বিশ্বাসী। বেদ বিশ্বাস বলতে কী বোঝায়? বেদকে অপৌরুষেয় ও অভ্রান্ত বলে গ্রহণ করাই বেদ বিশ্বাসের পরিচায়ক। অর্থাৎ এটা স্বীকার করা যে, বেদ বা শ্রুতি কোনও মানুষের রচনাই নয়, প্রাচীন সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের সাক্ষাৎ উপলব্ধি মাত্র। তাই বেদের পক্ষে ভ্রান্ত হওয়ার বা সংশয় সাপেক্ষ হওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। এক কথায়, শ্রুতি বা বেদই হল সনাতন সত্যের অদ্বিতীয় আকর।

তাই আস্তিক মতাবলম্বী দর্শনের মতে দার্শনিকদের কাজ হল, ওই আকর থেকে সত্য উদ্ধার করা ও তারই ব্যাখ্যা দেওয়া। সোজা কথায় বেদার্থ নির্ণয়, বেদের প্রকৃত তাৎপর্য ঠিক করা। তার মানে স্বাধীন যুক্তি বা বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে সত্য নিরূপণের কোনও রকম চেষ্টা করা নয়, বেদের মধ্যে যা রয়েছে, তাকেই শাশ্বত সত্য ধরে নিয়ে তার ভিত্তিতে কোনও কিছুকে বিচার করতে হবে। বস্তুত, প্রকৃত বেদপন্থীদের কাছে বেদার্থের অনুসন্ধানী ও অনুগামী না হলে যুক্তি-তর্ক বা অভিজ্ঞতার কোনও মূল্যই স্বীকৃত হতে পারে না। যে কথা শংকরাচার্য প্রমুখ প্রকৃত আস্তিক দার্শনিকেরা সুস্পষ্টভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন। তাই কোনও সম্প্রদায়ের দার্শনিক প্রচেষ্টা সত্যিই উপরোক্ত আদর্শের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে তাকে আস্তিক এবং সেই সীমা লঙ্ঘিত হলে তাকে নাস্তিক বলে চিহ্নিত করা সম্ভব।

সেই দিক থেকে বিচার করলে পূর্ব মীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা বা বেদান্তকে বেদমূলক, অর্থাৎ আস্তিক দর্শন হিসাবে স্বীকার করতে হবে। এর বিপরীতে লোকায়ত, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনকে সংশয়াতীতভাবে বেদ বিরোধী বা নাস্তিক দর্শন হিসাবে স্বীকার করতে হবে।

এর বাইরে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দর্শন রয়েছে– সাংখ্য, ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন। এদের ঠিক কী বলা হবে, তা নিয়ে সংশয় আছে। কারণ, ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে বেদের প্রতি মৌখিক সমর্থন আছে। যেমন, কণাদ ঘোষণা করেছিলেন যে, বেদ হল অব্যক্তের প্রকাশ এবং গৌতম তাঁর ন্যায় সূত্রের শুরুতেই বেদের অবিসংবাদী বৈধতা প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। সাংখ্য, ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের পরবর্তীকালের দার্শনিকদের যে ব্যাখ্যা গ্রন্থগুলো পাওয়া যায়, তাতে বেদান্তের প্রভাব সুস্পষ্টরূপে দেখা যায়। তাই কেউ কেউ এই দর্শনগুলিকে বেদপন্থী বা আস্তিক দর্শন হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু এই দার্শনিক সম্প্রদায়ের সূত্রগ্রন্থগুলি খুঁটিয়ে বিচার করলে আমরা দেখতে পাব যে, বেদের প্রতি মৌখিক আনুগত্য ছিল নিজেদের বস্তুবাদী ও যুক্তিবাদী ভাবনাগুলোকে সংরক্ষিত রাখার জন্য একটা কৌশলমাত্র। এ কথা কেন বলছি? কারণ তাঁরা যখন দার্শনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন, তখন বেদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের কোনও লক্ষণ আমরা দেখতে পাই না। দার্শনিক প্রশ্নে ন্যায়-বৈশেষিকদের মতো আর কেউ বেদের প্রতি এত তুচ্ছতার মনোভাব প্রকাশ করেননি। বাস্তবে তাঁদের দর্শনের মূল বিষয় অর্থাৎ পরমাণুবাদ ও যুক্তিবাদ

ধারাবাহিকভাবে ধর্মতত্ত্ব বহির্ভূত এবং তাঁরা তাঁদের বক্তব্য কেবলমাত্র বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ ক্ষেত্রে বেদের উপর নির্ভর করেননি। আবার, ভারতে ভাববাদের ব্যাপক প্রভাবের সময়কালে বস্তুবাদী দর্শনগুলোকেও বেদপন্থী করার প্রচেষ্টা ছিল সর্বত্র। সাংখ্য, ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের ক্ষেত্রেও এই ঘটনাই ঘটেছে। প্রকৃতপক্ষে এই দর্শনগুলি ছিল বেদবিরোধী বা নাস্তিক।

ভারতীয় দার্শনিক ঐতিহ্যে ভাববাদ ও বস্তুবাদ

আগেই বলেছি, ভারতীয় সভ্যতা হল পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাগুলির অন্যতম। এই সভ্যতার প্রায় নিরবচ্ছিন্ন ইতিহাস পাওয়া যায় খ্রিঃপূঃ ১৫০০ বছর সময়কাল থেকে। কেউ কেউ বৈদিক সভ্যতার সূচনা এরও আগে হয়েছে বলে মনে করেন। সেই হিসাব ধরলে এই সময়কাল আরও বেশি হবে। সে যাই হোক, এই সময়কাল সাড়ে তিন হাজার বছরের কম নয়। স্বাভাবিকভাবেই এই দীর্ঘ সময়কালে মানুষের চিন্তার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। ফলে, এ দেশে বহু দার্শনিক মতবাদের জন্ম হয়েছে। তাদের মধ্যে সামগ্রিক অর্থে ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সমস্ত কিছু বিচার করেছে তিনটি দার্শনিক সম্প্রদায়– শূন্যবাদ, বিজ্ঞানবাদ এবং অদ্বৈত বেদান্ত। আর সমস্ত দিক থেকে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সবকিছু বিচার করেছে তিনটি দার্শনিক সম্প্রদায়- লোকায়ত বা চার্বাক, সাংখ্য, এবং ন্যায় - বৈশেষিক। এর বাইরে আরও কিছু দার্শনিক সম্প্রদায় আছে, যাঁদের চিন্তায় বস্তুবাদের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁরা ভাববাদের প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। এই দর্শনগুলি হল– বৌদ্ধ ধর্মের দুটি সম্প্রদায়, সৌত্রান্ত্রিক সম্প্রদায় ও বৈভাসিক সম্প্রদায়, জৈন দর্শন ও পূর্ব মীমাংসা। প্রাচীন ভারতে আমরা প্রধানত এই দর্শনগুলি পাই। এবার আমরা এই দার্শনিক মতবাদগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

সবচেয়ে বলিষ্ঠ ভারতীয় বস্তুবাদী দর্শন লোকায়ত

আগেই বলেছি, এ দেশে সামগ্রিকভাবে বস্তুবাদী দর্শনকে বলিষ্ঠভাবে অনুসরণ করছে তিনটি দার্শনিক সম্প্রদায়- লোকায়ত, সাংখ্য এবং ন্যায়-বৈশেষিক। প্রথমে এই তিনটি দর্শন সম্পর্কে একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করছি।

লোকায়ত সবচেয়ে বলিষ্ঠভাবে ভাববাদের বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু ভাববাদী দর্শনের পৃষ্ঠপোষক শাসকেরা লোকায়তর কোনও পুঁথি আস্ত রাখেনি। ফলে লোকায়ত দর্শনের প্রবক্তারা ঠিক কী বলেছিলেন, তা তাঁদের রচনা থেকে সরাসরি জানবার কোনও উপায় নেই। তাহলে আমরা কীভাবে লোকায়ত দর্শন সম্পর্কে জানতে পারলাম? তিনটি উৎস থেকে আমরা তাদের বক্তব্য জানতে পেরেছি : (১) কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, কৌটিল্যের মতে বিদ্যা চার রকম- আন্বিক্ষিকী (বা অনুমানমূলক দর্শন), ত্রয়ী, বার্তা ও দণ্ডনীতি। ত্রয়ী মানে তিন বেদ, বার্তা মানে কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য সংক্রান্ত বিদ্যা, দণ্ডনীতি মানে রাজ্য শাসন বিদ্যা। আর আন্বিক্ষিকী বলতে কৌটিল্য তিনটি দর্শনকে বুঝিয়েছেন যথা লোকায়ত, ন্যায়-বৈশেষিক অর্থে যোগ এবং সাংখ্য।

(২) লোকায়ত বিরোধী দার্শনিকদের পূর্বপক্ষ হিসাবে লোকায়ত বর্ণনা। স্বাভাবিকভাবেই বহু ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, এই দর্শনকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য এর বিকৃত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যেমন, লোকায়ত সম্পর্কে একটা কথা বহুল প্রচলিত যে, তাদের মতে 'ঋণং কৃত্য, ঘৃতং পিবেত'। যেন লোকায়তিরা ভোগসর্বস্ব জীবনের চর্চা করে। ফলে পূর্বপক্ষ বর্ণনাকে হুবহু গ্রহণ করা যায় না। অন্যান্য উৎসের সাথে মিয়ে গ্রহণ করতে হয়।

(৩) প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা কিছু প্রচলিত, অতএব প্রামাণিক, লোকগাথা।

দু'একটা উদাহরণ হল এইরকম– ''জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে নিহত পশু যদি সরাসরি স্বর্গেই যায়, তাহলে যজমান কেন নিজের পিতাকে হত্যা করে না।"

''কেউ মারা যাওয়ার পর শ্রাদ্ধকর্ম যদি তার তৃপ্তির কারণ হয়, তাহলে তো প্রদীপ নিভে যাওয়ার পরেও তেল ঢেলে তার শিখা প্রদীপ্ত করা যেত।"

''যে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে তার পাথেয় (পিণ্ড) কল্পনা করা বৃথা, কেন না তাহলে ঘর ছেড়ে কেউ গ্রামান্তরে গমন করলে ঘরে বসে তার উদ্দেশ্যে পিণ্ড দিলেই তো তার পাথেয় ব্যবস্থা সম্পন্ন হত।"

এখানে আরেকটি বিষয়ও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, লোকায়তকে চার্বাক দর্শন হিসেবেও অভিহিত করা হয়। চার্বাক নামকরণের মধ্যেও এই দর্শনকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চোখে পড়ে। কারণ অনেকে মনে করেন, মহাভারতে উল্লেখিত চার্বাক রাক্ষসের নামেই এই দর্শনকে চার্বাক নাম দেওয়া হয়েছে।

এবার দেখা যাক, লোকায়ত দর্শন বলতে কী বোঝায়? লোকায়ত দর্শন বলতে বোঝায় ভুতবাদ, দেহাত্মবাদ, প্রত্যক্ষ প্রামাণ্যবাদ, স্বভাববাদ, এবং পরলোক বিলোপবাদ।

ভুতবাদ ঃ লোকায়ত মতে ক্ষিতি, অপ, তেজ ও বরুণ (পৃথিবী, বাতাস, আগুন ও জল), এই চতুর্ভুতই চরম সত্য।

এর বাইরে কোনও সত্যের অবস্থান নেই।

দেহাত্মবাদ ঃ দেহাতিরিক্ত আত্মার কল্পনা নিতান্তই অলীক। আত্মাবাদীরা প্রশ্ন করেছে যে, দেহের কোনও উপাদানের মধ্যেই তো চেতনার উপস্থিতি নেই, তাহলে দেহের মধ্যে চেতনা বা আত্মা এল কোথা থেকে? এই প্রশ্নের উত্তরে লোকায়তিকরা বলেন, বাহ্য ভূতবস্তুগুলিতে স্বতন্ত্রভাবে চেতনার প্রকাশ নেই, সেগুলি জড়বস্তুই। কিন্তু এই জড় বস্তুগুলি শরীরাকারে পরিণত হলে তাতে চৈতন্যের উদ্ভব হয়। তাঁরা দেহের মধ্যে জ্ঞান বা চৈতন্যের উদ্ভবকে মদশক্তি তৈরির প্রক্রিয়ার সাথে তুলনা করেছেন। অর্থাৎ মদ তৈরির জন্য কিন্ব, খামির বা গাঁজ প্রভৃতি বস্তু ব্যবহার করা হয়। এগুলির কোনওটিতেই মদশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু এগুলি দিয়ে মদ তৈরি করলে মদশক্তির উদ্ভব হয় বা সেই মদ খেলে নেশা হয়। একইভাবে জড় বস্তুগুলিই দেহ আকারে পরিণত হলে, অর্থাৎ এগুলি থেকেই দেহ তৈরি হলে সেই দেহে চৈতন্যের উদ্ভব হয়। তাই লোকায়ত মতে মানুষ বলতে চৈতন্য বিশিষ্ট দেহ ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই স্বর্গ গমন বা মোক্ষ লাভে সমর্থ আত্মা নেহাতই কাল্পনিক। আত্মাবাদীরা প্রাণ, চৈতন্য, স্মৃতি প্রভৃতিকে আত্মার গুণ বা ধর্ম বলে কল্পনা করেন। লোকায়ত মতে এ সবই দেহতে উপলব্ধ হয়, দেহ ছাড়া আর কোথাওই উপলব্ধ হয় না। তাই দেহকে বাদ দিয়ে এমন কিছু মানা যায় না, যার ধর্ম বা গুণ বলতে প্রাণ, চেষ্টা, চৈতন্য, স্মৃতি প্রভৃতিকে আত্মা বলে মানবার সুযোগ আছে। দেহের বর্তমানতায় বর্তমান, অবর্তমানতায় অবর্তমান বলে এগুলিকে দেহধর্ম বলেই মানতে হবে। এই অর্থে দেহই আত্মা, বা দেহাত্মবাদ।

প্রত্যক্ষ প্রামাণ্যবাদ ঃ লোকায়ত মতে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই কোনও কিছুর অস্তিত্ব প্রমাণ করতে সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। তাই অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের অনুমান অবান্তর। কিন্তু লোকায়তিকরা কোনও অনুমানই স্বীকার করেন না, তা নয়, পূর্বানুভূত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অনুমান লোকায়ত স্বীকার করে। কেবল পরলোক, কর্মফল, আত্মা প্রভৃতি বিষয়ে অনুমান নিষ্ফল, একদল ধূর্ত এইসব বিষয়ে অনুমান প্রমাণ দেখাবার চেষ্টা করে লোক ঠকাবার জন্য।

স্বভাববাদ ঃ স্বভাবই জগৎ বৈচিত্রের কারণ। তাই জগৎস্রষ্টা বা ঈশ্বরের চিন্তা অবশ্যই অলীক। এখন প্রশ্ন হল, স্বভাববাদ বলতে আমরা কী বুঝব? জল শীতল। কেন? কারণ, জলের স্বভাবই হল শীতল হওয়া। অগ্নি উষ্ণ। কেন? কারণ, অগ্নির স্বভাবই হল উষ্ণ হওয়া। একইভাবে লোকায়তর পক্ষ থেকে অনায়াসে বলা যায়, চতুর্ভুতের স্বভাবই হল, পরিস্থিতি বিশেষে তা 'দেহাকারে পরিণত হয় এবং দেহাকারে পরিণত হলে তাতে চেতনার উদ্ভব হয়।' মনে রাখতে হবে, স্বভাববাদের মূল কথাটা হল প্রাকৃতিক নিয়ম। জৈন দার্শনিক গুণরত্ন স্বভাববাদ প্রসঙ্গে বলেছেন, ''স্বভাববাদীরা নিম্নোক্ত দাবি করবেন, স্বভাব বলতে বোঝায় বস্তুর স্বীয় বা স্বকীয় পরিণাম। স্বভাবের জন্যই সবকিছুর উৎপত্তি। যেমন, মৃত্তিকার পরিণাম ঘট, পট নয়। তেমনই তন্তু বা সুতো থেকে শুধু পটই তৈরি হয়। স্বভাব ছাড়া এ ধরনের পরিণাম নিয়মের কোনও ব্যাখ্যাই সম্ভব নয়। অতএব সবকিছুই স্বভাবের পরিণাম বলতে হবে।"

পরলোক বিলোপবাদ ঃ পরলোকগামী আত্মার অভাবে পরলোকের পরিকল্পনাও অবান্তর। অর্থাৎ লোকায়তিকেরা পরলোকে বিশ্বাস করেন না। দেহাত্মবাদের ধারণার সাথে পরলোক বিলোপবাদ ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। অর্থাৎ দেহাত্মবাদ মানলে পরলোক বিলোপবাদ মানতেই হবে।

সাংখ্য হল প্রাচীন বস্তুবাদী দর্শন

সাংখ্য দর্শনের প্রবর্তক কপিল। কিন্তু কপিল সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রায় কিছুই পাওয়া যায় না।

সাংখ্য দর্শনের পুঁথি ঃ সাংখ্যের যে দুটি সূত্রগ্রন্থ পাওয়া যায়, সেগুলি হল সাংখ্যকারিকা ও সাংখ্যসূত্র। সাংখ্যকারিকার রচনাকাল খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী। সাংখ্যসূত্রের রচনাকাল খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী। কিন্তু সাংখ্যসূত্রে প্রকৃত সাংখ্য মত পাওয়া যায় না। তা বেদান্ত মতে ভরপুর। সাংখ্যসূত্রের রচয়িতা নিজে বেদান্তবাদী ছিলেন। সাংখ্যকারিকাতেও ভাববাদী মতের পরিচয় পাওয়া যায়। সাংখকারিকার টীকাকারদের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হলেন বাচস্পতি মিশ্র। তাঁর গ্রন্থের নাম সাংখ্য তত্ত্বকৌমুদী। তিনি ঈশ্বরবাদী ছিলেন। তাই তাঁর রচনাতেও সাংখ্য দর্শনকে ঈশ্বরবাদী দর্শনে পরিণত করার প্রয়াস রয়েছে। কিন্তু আদি সাংখ্যমত ছিল সম্পূর্ণরূপে বস্তুবাদী।

আদি সাংখ্যের উৎস ঃ ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকায় ষষ্ঠিতন্ত্রের উল্লেখ আছে। বাচস্পতি মিশ্র তাঁর সাংখ্যকারিকার টীকায় 'বাজবার্তিক' নামের একটি পুরনো পুঁথির উল্লেখ করেছেন। জৈন দার্শনিক গুণরত্ন আরও দুটি পুঁথির উল্লেখ করেছেন, আত্রেয়তন্ত্র ও সাঠরভাষ্য। কিন্তু এর সবকটিই বিলুপ্ত হয়েছে। তাছাড়া কপিলেরও কোনও রচনা পাওয়া যায় না। গৌতম বুদ্ধের অনেক আগে থেকেই, এমনকি উপনিষদ রচিত হওয়ার আগে থেকেই আমাদের দেশে এই দর্শনের প্রভাব ছিল।

চরকসংহিতায় যে সাংখ্যমতের পরিচয় পাওয়া যায়, তা সাংখ্যকারিকা থেকে আলাদা। মহাভারতে সাংখ্য এবং যোগকে বেদের মতোই সনাতন বলা হয়েছে। গৌতম বুদ্ধের দুই গুরু, আষাড় কালাম ও উদ্দক রামপুত্ত সাংখ্য মতাবলম্বী ছিলেন। বুদ্ধের বয়োজ্যেষ্ঠ পুকুধ কাত্তায়ন সাংখ্যমতে বিশ্বাসী ছিলেন। অনেকে মনে করেন বুদ্ধের জন্মস্থানের নাম কপিলাবস্তু কপিলের নাম অনুসারে হয়েছে।

সাংখ্য মতের মূল বৈশিষ্ট্য কী ঃ সাংখ্যমতকে বলা হয় সৎকার্যবাদ বা পরিণামবাদ। সাংখ্যমতে কার্য একান্তভাবেই কারণের পরিণাম। কার্যের মধ্যে এমন কিছু থাকতে পারে না, যা কারণের মধ্যে অন্তত অস্পষ্ট বা বীজাকারে হলেও বর্তমান নেই। তাই কার্যের মধ্যে যা বর্তমান, তা কারণের মধ্যেও অনুমান করা যায়।

সাংখ্যমতকে অচেতনকারণবাদও বলা হয়। কারণ, সাংখ্যমতে পরিদৃশ্যমান জগৎ আসলে কার্য এবং তা জড়রূপ। সাংখ্যে জড়রূপ জগৎকারণকে বলা হয় প্রকৃতি বা প্রধান। এই প্রকৃতি বলতে যে জগৎকে আমরা দেখি, সেই স্থূল জগৎ নয়। প্রকৃতির উপাদান ত্রিবিধ– সত্ব, রজঃ ও তমঃ। এগুলিকে পারিভাষিক অর্থে গুণ বলা হয়। তিনটি গুণের মধ্যে সাম্যাবস্থা বিঘ্নিত হলে প্রকৃতি থেকে ক্রমশ স্থূল জগতের সৃষ্টি হয়। এই মত হল আদি সাংখ্যের মত।

পরবর্তীকালে প্রকৃতির সাথে পুরুষ যুক্ত করা হয়েছে। যদিও এই পুরুষ উদাসীন, অপ্রধান ও বহু। এই পুরুষ নিষ্ক্রিয়, বাস্তবে তার কোনও ভূমিকা নেই। তারও পরবর্তীকালে, বিশেষ করে সাংখ্যসূত্রে এই পুরুষকে ব্রহ্ম-এর সাথে তুলনা করা হয়েছে। পুরুষকে সেখানে চেতন আত্মার সাথে তুলনা করা হয়েছে। চরক সংহিতায় সাংখ্য দর্শনের যে সংস্করণ পাওয়া যায়, তাতে দেখানো হয়েছে যে, প্রকৃতি থেকেই পুরুষের উৎপত্তি। অর্থাৎ অচেতন পদার্থ থেকেই চেতন পদার্থের উৎপত্তি।

তান্ত্রিক ধ্যান ধারণায় সাংখ্য ঃ সাংখ্যের মতো পুরুষ ও প্রকৃতি নিয়েই তন্ত্র এবং তন্ত্রেও প্রকৃতির ভূমিকা এত বেশি এবং তার পাশে পুরুষের ভূমিকা এতই নগণ্য যে, আপাতদৃষ্টিতে এ কথাও মনে হতে পারে যে, নেহাতই অকৃত্রিম ও অসংলগ্নভাবেই তন্ত্রে পুরুষের কথা প্রবেশ করেছে। মূল তত্ত্বের দিক থেকে সাংখ্যের সঙ্গে তন্ত্রের সাদৃশ্য বিস্ময়কর।

তন্ত্রের সাথে তত্ত্বগতভাবে সাংখ্যের সাদৃশ্য এবং প্রাচীন পুঁথিপত্রে সাংখ্যকে তন্ত্র বলে উল্লেখ করার নজির থেকে আমরা বলতে পারি যে, সাংখ্য হল আদিম তন্ত্রের দার্শনিক সংস্করণ। বেদান্ত যেখানে বৈদিক ঐতিহ্যবাদী, আদি ও অকৃত্রিম সাংখ্য সেখানে তান্ত্রিক ঐতিহ্যবাদী। সাংখ্যের মতো লোকায়ত দর্শনের মূলও তান্ত্রিক ঐতিহ্যে প্রোথিত।

এ দেশে যুক্তিবাদের বলিষ্ঠ প্রতিনিধি
ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন

বৈশেষিক ও ন্যায় সম্প্রদায়ের দার্শনিকদের মতাদর্শের মধ্যে সাদৃশ্য এতটাই যে, নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক আচার্যরা ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনকে সমানতন্ত্র হিসাবে স্বীকার করেছেন। পার্থক্য এইটুকুতেই যে, বৈশেষিক দর্শনে অধিবিদ্যা ও পদার্থবিদ্যার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। আর ন্যায় দর্শনে তর্কবিদ্যার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

বৈশেষিক দর্শন ঃ এই দর্শনের প্রবক্তা কণাদ। তিনি উলুক নামেও পরিচিত ছিলেন। বৈশেষিক সূত্রের রচনাকাল তৃতীয় খ্রিঃ পূর্বাব্দ বলে মনে করা হয়। অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের মতে তা বুদ্ধপূর্ব এবং সম্ভবত ভারতের দর্শন সাহিত্যের ইতিহাসে প্রাচীনতম সূত্রগ্রন্থ।

বৈশেষিক দর্শনের মূল বিষয় বলতে সাত রকম পদার্থ। অর্থাৎ বিশ্বসংসারের সমস্তকিছুই নিম্নলিখিত সাতটি শ্রেণিতে বিভক্ত করতে হবে– দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব। অবশ্য এই অভাব পদার্থটি বৈশেষিক সম্প্রদায়ের প্রাচীন সংস্করণে ছিল না। তাই একে ষঠপদার্থ বর্ণন হিসাবে বলা হয়েছে। দ্রব্য নামের পদার্থ আবার নয় রকম- পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক, আত্মা ও মন। এর মধ্যে প্রথম পাঁচটি দ্রব্য, অর্থাৎ, পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশকে বলা হয় পঞ্চভূত। এই পাঁচটি দ্রব্যের সাধারণ সংজ্ঞা হল ভুত বা ম্যাটার। এর মধ্যে আকাশ ছাড়া বাকি চারটির মূলে আছে পরমাণু। পৃথিবী হল আসলে পরমাণুপুঞ্জই। পরমাণু নিত্য, তার উৎপত্তি নেই, বিনাশ নেই। তাই বৈশেষিক দর্শনকে পরমাণুবাদ আখ্যা দেওয়া হয়, যার মূল কথা হল, অচেতন ও নিত্য পরমাণুপুঞ্জই সমস্ত দ্রব্যের মূল উপাদান।

ন্যায় দর্শন ঃ ন্যায় দর্শনের প্রবর্তক গোতম বা গৌতম। আবার তিনি অক্ষপাদ বলেও চিহ্নিত হয়েছেন। এর অর্থ হল পায়ের চোখ। তাই তিনি চরণাক্ষ বা পদাক্ষক হিসাবেও অভিহিত হয়েছেন।

ন্যায় দর্শন তর্কবিদ্যার জন্য প্রসিদ্ধ। এই দর্শনের পদার্থ সম্পর্কিত ধারণা বৈশেষিক দর্শনের সমতুল। এই দর্শনকে বেদপন্থী হিসাবে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু বাস্তব হল, ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনকে বেদপন্থী প্রতিপন্ন করা খুবই কঠিন।

কারণ, প্রথমত, অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে কৌটিল্য যে চার রকম বিদ্যার কথা বলেছেন, তাতে আন্বিক্ষিকী অন্যতম। আন্বিক্ষিকী (অর্থাৎ অনুমানমূলক দর্শন) বলতে তিনটি দর্শনের কথাই বলা হয়েছে- সাংখ্য, যোগ এবং লোকায়ত। যে দার্শনিক মতকে আমরা ন্যায়-বৈশেষিক নামে শনাক্ত করতে অভ্যস্ত, প্রাচীনকালে তাকেই যোগ নামে অভিহিত করা হত। কৌটিল্য বেদ সংক্রান্ত বিদ্যাকে পৃথকভাবে ত্রয়ী হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। দ্বিতীয়ত, আন্বিক্ষিকী বলতে যে তর্কবিদ্যা বোঝাত, বেদান্তবাদী ব্রহ্মসূত্রে সেই তর্কবিদ্যাকে শ্রুতি বিরুদ্ধ বলেই অভিহিত করা হয়েছে। তৃতীয়ত, মনে রাখা দরকার, অত্যন্ত প্রাচীনকাল থেকেই প্রকৃত বৈদিক ঐতিহ্যে তর্কবিদ্যা নিন্দিত ও প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। মনু হেতুশাস্ত্র বা তর্কবিদ্যার কঠোর সমালোচনা করেছেন এবং তর্কাবলম্বীদের বৈদিক দল থেকে বহিষ্কারের নির্দেশ দিয়েছেন।

ন্যায়-বৈশেষিকদের ভাববাদ খণ্ডন ঃ ভাববাদের মূল কথা হল, বহির্জগত মিথ্যা, লোকব্যবহারমূলক সমস্ত জ্ঞানই আসলে ভ্রমজ্ঞান। ভাববাদ খণ্ডন বলতে এই মূল দাবিগুলির খণ্ডন। যেমন, শংকরাচার্য বলেছেন, আত্মণ বা ব্রহ্মণই সত্য। আপাতদৃষ্টিতে যাকে বস্তু বলে মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে তার কোনও স্বাধীন সত্তা থাকতে পারে না। এক্ষেত্রে স্বপ্নাবস্থার জ্ঞানকে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

এই ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে ন্যায়-বৈশেষিকরা বলেন, স্বপ্নাবস্থার জ্ঞান যে ভ্রমজ্ঞান, তা পরে তার বাধক কোনও জ্ঞান ব্যতীত প্রতিপন্ন করা যায় না। সুতরাং জাগ্রত অবস্থার জ্ঞানকেই তার বাধক হিসাবে বলতে হবে। তা হলে সেই জ্ঞানকেও যথার্থ বলে স্বীকার করতে হবে। কারণ যথার্থ জ্ঞান ব্যতীত ভ্রমজ্ঞানের বাধক হতে পারে না।

আবার স্বপ্ন সম্পর্কে ন্যায়-বৈশেষিকদের মত হল, তা নিরালম্বন (অর্থাৎ অবলম্বনহীন) নয়। তার বিষয় হল, দেশান্তর-কালান্তরে অবস্থিত পূর্বানুভূত বাহ্যবস্তুই। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক সম্প্রদায়ের কথা এই যে, স্বপ্নের পরে জাগরিত হলে 'আমি পাহাড় দেখেছিলাম', 'আমি হাতি দেখেছিলাম' ইত্যাদি রূপেই ওই স্বপ্ন দর্শনের মানসজ্ঞান জন্মে। এর কারণ অতীতে কোনও স্থানে ওই ব্যক্তি যথার্থই পাহাড় বা হাতি দেখেছিলেন। সে জন্যই স্বপ্নে তার পাহাড় বা হাতি দর্শন হয়েছে। তাই স্বপ্নের বিষয়বস্তু অলীক নয়, তা যথার্থ বা বাস্তব।

ন্যায়-বৈশেষিকদের আত্মা সম্পর্কিত ধারণা ঃ ন্যায়-বৈশেষকরা আত্মার অস্তিত্বের প্রতি মৌখিক সমর্থন জানিয়েছেন। তা থেকে অনেকে একে ভাববাদী প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিকরা আত্মা বলতে ঠিক কী বুঝিয়েছেন? আত্মা কি সত্যিই স্বয়ং-চেতন পদার্থ, যা ভাববাদীরা বিশ্বাস করেন? নাকি কোনও রকম বিশিষ্ট পরিবেশে আত্মার মধ্যে চৈতন্য বলে গুণের উদ্ভব হয়?

এর উত্তরে ন্যায়-বৈশেষিকরা বলেন, আত্মার স্বরূপ বলতে জড় বস্তুই। তার মধ্যে চৈতন্যের পরিচয় নেই। শুধুমাত্র একটি বিশেষ অবস্থায় আত্মার মধ্যে চৈতন্য বলে গুণটির উদ্ভব হয়। কী রকম অবস্থা?

প্রথমত, আত্মার সঙ্গে দেহের সংযোগ; দ্বিতীয়ত, দেহের সঙ্গে অন্তঃইন্দ্রিয়ের সংযোগ; তৃতীয়ত, অন্তঃইন্দ্রিয়ের সাথে বহিঃইন্দ্রিয়ের সংযোগ; চতুর্থত, বহিঃইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বিষয় বা বাহ্য বস্তুর সংযোগ। এই সংযোগের পরম্পরার অভাবে আত্মা তার স্বীয় স্বভাব অনুসারে যে জড়বস্তু, সেই জড় বস্তুই থেকে যায়, মাটির ঢেলা বা কাঠের টুকরোর মতো। স্পষ্টতই এখানে বস্তু থেকেই যে চেতনার উদ্ভব, তার একটা প্রক্রিয়াগত ধারণা পাওয়া যায়।

বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন ঃ নিরীশ্বরবাদী চিন্তার প্রকাশ

পঞ্চম খ্রিস্টপূর্বাব্দ ছিল ভারতীয় ইতিহাসে ক্রান্তিকাল। প্রায় এক হাজার বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত বৈদিক সমাজের রীতিনীতি, সংস্কৃতি, দর্শন প্রভৃতি একটা ধাক্কা খেয়েছিল এই সময়। সমস্ত দিক থেকেই একটা নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছিল। কঠোর সামাজিক বিধি ও জাতপাতের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে দুটি ধর্মীয় আন্দোলন গোটা ভারতীয় ভূখণ্ডে আলোড়ন তুলেছিল। এই দুটি ধর্ম আন্দোলন বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। এই দুটি ধর্ম আন্দোলনের দুই মহান প্রবক্তা গৌতম বুদ্ধ ও মহাবীর জৈন ছিলেন নিরীশ্বরবাদী। তাঁরা কেউই ঈশ্বর মানতেন না। তাই তাঁদের চিন্তায় সব প্রশ্নে না হলেও বহুক্ষেত্রেই বস্তুবাদী চিন্তার প্রতিফলন পাওয়া যায়।

বৌদ্ধ দর্শন ঃ গৌতম বুদ্ধ কোনও দার্শনিক মত প্রচার করেননি। কিন্তু তাঁর চিন্তাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ভাববাদী দর্শনের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে যে দুটি ভাবনা, ঈশ্বরে বিশ্বাস ও বস্তু বহির্ভূত আত্মার স্বীকৃতি, বুদ্ধ তার বিরোধিতা করেছিলেন।

বুদ্ধের চিন্তার সবচেয়ে যুগান্তকারী ভাবনা হল, প্রতীত্য সমুৎপাদ। এর অর্থ হল, সমস্ত কিছুই পরিবর্তনশীল এবং এই পরিবর্তন কার্য-কারণ নিয়মের বিচ্ছিন্ন প্রবাহ। একের বিনাশের পর অন্যের উৎপত্তি, বুদ্ধ এই নিয়মের নাম দিয়েছিলেন,

প্রতীত্য সমুৎপাদ। এর অর্থ হল, প্রতিটি উৎপাদকের কোনও না কোনও প্রত্যয় থাকে। প্রত্যয় ও হেতু (অর্থাৎ কারণ) সমার্থক শব্দ। বুদ্ধের মতে প্রত্যয় থেকে উৎপন্নর অর্থ হল, অতীত থেকে উৎপন্ন, অর্থাৎ কোনও বস্তু ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরে নতুন বস্তুর উৎপাদন সম্ভব। তার প্রত্যয় হল এমন এক হেতু,যাকে কোনও বস্তু বা ঘটনা সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই লুপ্ত হতে দেখা যায়।

বুদ্ধের চিন্তার রক্ষণশীলতার দিক হল, পুনর্জন্মের ধারণা। এর মধ্যেই রয়েছে ভাববাদ অনুপ্রবেশের পথ। তাই বুদ্ধের মৃত্যুর পরে বৌদ্ধ ধর্ম দুটি সম্প্রদায়ে ভাগ হয়ে যায়, হীনযান ও মহাযান। প্রথম সম্প্রদায় থেকে দুটি দার্শনিক মতের উদ্ভব হয়েছিল, সৌত্রান্ত্রিক ও বৈভাসিক। এদের ভাবনায় বস্তুবাদের প্রভাব লক্ষ করা যায়। দ্বিতীয় সম্প্রদায় থেকে দুটি দার্শনিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে, মাধ্যমিক ও যোগাচার। প্রথমটির দার্শনিক মত হল শূন্যবাদ এবং দ্বিতীয়টির দার্শনিক মত হল বিজ্ঞানবাদ। এই দুটি দর্শনই পুরোপুরি ভাববাদী দর্শন।

জৈন দর্শন ঃ জৈন দর্শনের মূল কথা হল, সাধারণ অভিজ্ঞতায় আমরা জগৎকে যে ভাবে দেখি, তাই সত্য বা যথার্থ। এই জগতে বস্তুর অস্তিত্ব আছে। তাই কোনও এক ও অদ্বিতীয় পরম সত্তার কথা কল্পনা করা নিরর্থক। এটা বস্তুবাদেরই কথা।

আবার মহাবীর জৈন বলেছিলেন, এই বস্তু সমূহ দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত, জীব ও অজীব। জীবন্ত প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই জীব বা আত্মা আছে, তার দেহ যেমনই হোক না কেন। তাই সমস্ত জীবের প্রতি অহিংসাই জৈন ধর্মের মূল কথা।

জৈন দর্শনের আরেকটি মূল কথা হল, স্যাৎবাদ। সত্তার বহুমুখী দিক সম্পর্কে সামগ্রিক উক্তি একমাত্র পূর্ণজ্ঞানীর পক্ষেই সম্ভব। আমরা পূর্ণজ্ঞানী নই। সে জন্য প্রত্যেক বিষয়ে আমাদের প্রতিটি উক্তিই সম্ভাবনামূলক। এই সম্ভাবনার নির্দেশক শব্দ হল স্যাৎ। তাই আমাদের প্রতিটি উক্তির সাথে স্যাৎ শব্দ ব্যবহার করতে হবে। তা ছাড়া সমস্ত রকম বিকল্প সম্ভাবনার কথা মনে রাখা প্রয়োজন। অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ বলেছিলেন যে, এই স্যাৎবাদের মধ্যেই আধুনিক স্ট্যাটিস্টিকসের মূল সূত্রের আভাস পাওয়া যায়।

বৈদিক ঐতিহ্যে ভাববাদ বিরোধী দর্শন ঃ মীমাংসা

বৈদিক ঐতিহ্য থেকে প্রধানত দুটি দার্শনিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে, পূর্ব মীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা। উত্তর মীমাংসা থেকে ভারতের সবচেয়ে প্রভাব বিস্তারকারী ভাববাদী দর্শন অদ্বৈত বেদান্তের উদ্ভব। আর পূর্ব মীমাংসা থেকে উদ্ভব হয়েছে ভাববাদ বিরোধী দর্শন মীমাংসা।

মীমাংসা দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়নি। মীমাংসা দর্শনের প্রবক্তা হিসাবে জৈমিনির নাম পাওয়া যায়। জৈমিনি ঈশ্বরের উল্লেখ করেন নি। স্বর্গকে মীমাংসকেরা যজ্ঞফল বলে স্বীকার করেছেন। এর মধ্যে লোকোত্তরের ধারণা, অর্থাৎ ইহলোকের বাইরে কোনও জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি। মীমাংসা মতে সুখ লাভই মানুষের চরম উদ্দেশ্য। যজ্ঞ এই সুখ লাভের উপায়মাত্র। এই সুখ বলতে ইহলৌকিক সুখের কথাই বোঝানো হয়েছে। পূর্ব মীমাংসাকে কর্ম মীমাংসাও বলা হয়ে থাকে। কারণ, বেদের কর্মকাণ্ডের মধ্যে এই দর্শনের মূল প্রোথিত রয়েছে। যজ্ঞের ধারণার মধ্যে প্রাচীন জাদুবিশ্বাসের প্রভাব পাওয়া যায়। তাই বেদান্তের মোক্ষর ধারণা মীমাংসা দর্শনে পাওয়া যায় না। মীমাংসকদের পক্ষ থেকে ভাববাদ খণ্ডন অপরিহার্য। কারণ প্রত্যক্ষসিদ্ধ বহির্জগৎ বাস্তব বা যথার্থ না হলে যজ্ঞকর্ম, যজ্ঞফল প্রভৃতি সবই অর্থহীন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। মীমাংসা দর্শনের দার্শনিকদের মধ্যে কুমারিল সবচেয়ে বলিষ্ঠভাবে ভাববাদ খণ্ডন করেছেন।

কিন্তু মীমাংসা দর্শনের রক্ষণশীলতার দিকও রয়েছে। অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে ভাববাদ খণ্ডন করলেও মীমাংসা দর্শন দাঁড়িয়ে আছে বেদের অভ্রান্ততার ধারণার উপর। অর্থাৎ বেদকে তাঁরা সনাতন ও শাশ্বত হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এই দর্শনের উদ্ভবই হয়েছে বৈদিক যাগযজ্ঞের বৈধতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে। তাই বেদের বৈধতা প্রমাণ তাঁদের দর্শন চর্চার অন্যতম উদ্দেশ্য হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। সেই জন্যই তাঁরা ধারাবাহিকভাবে বস্তুবাদী থাকতে পারেন নি।

ভারতীয় ভাববাদী দর্শন

আমাদের দেশে ভাববাদী দর্শনের প্রথম স্পষ্ট প্রকাশ দেখা যায় উপনিষদের মধ্যে। উপনিষদে ভাববাদী চিন্তার প্রবক্তা হিসাবে রাজা অজাতশত্রু, ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য এবং এমনকি দেবতা প্রজাপতি ও ইন্দ্রের নাম পাওয়া যায়। পরম সত্যের প্রকাশ হিসাবে এখানে যে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, সেটি হল 'ব্রহ্মণ'। একে আত্মার সাথে সমার্থক ধরা হয়েছে। তাই উপনিষদে একে আরেকভাবে বলা হয়েছে 'আত্মণ'। এই আত্মা বা আত্মণকে উপনিষদের ভাববাদীরা বলেছেন, বিজ্ঞান-ঘন বা কেবলমাত্র চেতনা।

উপনিষদের প্রাচীন ভাববাদীরা বস্তুজগতের বাস্তব অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছেন, বাস্তব জগৎকে অলীক স্বপ্নের সাথে তুলনা করেছেন। ফলে তাঁরা মনে করতেন, প্রকৃতি

সম্পর্কে কোনও ধারণা গড়ে তোলা যায় না। আমরা যা জানি বলে মনে করি, তা আসলে অলীক কল্পনা। এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, উপনিষদের যুগে দার্শনিক চিন্তার জন্ম হলেও তাকে সুনির্দিষ্ট দার্শনিক তত্ত্বের রূপ দেওয়া সম্ভব হয় নি। সেই যুগের চিন্তাবিদরা তাঁদের চিন্তাকে অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা হিসাবে দেখেছিলেন। কিন্তু কেন তাঁরা একে প্রজ্ঞা বলেছেন, সে সম্পর্কে কোনও প্রমাণ দেওয়ার কথা ভাবেন নি। কখনও কখনও তাঁরা ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সেই ব্যাখ্যা বা যুক্তিগুলো ছিল একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের। তখনও কোনও সিস্টেম অফ ফিলজফিক্যাল থট-এর জন্ম হয়নি। অর্থাৎ অন্যান্য দার্শনিক চিন্তার সাথে দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্য দিয়ে একটি বিশেষ দার্শনিক তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করার যে ঐতিহ্য ভারতীয় দর্শন চিন্তার বিকাশের ইতিহাসে পরবর্তী সময়ে পাওয়া যায়, উপনিষদে তা পাওয়া যায় না।

ভাববাদী দর্শনের প্রথম প্রকাশ ঃ মহাযান বৌদ্ধমত। উপনিষদের যুগের পরবর্তী ছয়শ' বছরে অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতক থেকে খ্রিস্টীয় প্রথম শতক পর্যন্ত সময়কালে আমরা উপনিষদের এই চিন্তার কথা শুনতে পাইনি। ফলে বোঝা যায়, এই ছয়'শ বছরে উপনিষদ নিয়ে চর্চা বিশেষ হয়নি। কিন্তু ইতিহাসের নির্মম পরিহাস হল এই যে, যাঁরা উপনিষদের চিন্তার পুনর্জীবন দান করলেন, তাঁরা নিজেদেরকে বুদ্ধের অনুগামী বলে পরিচয় দিতেন, যে বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভব হয়েছিল বৈদিক ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে একটা ব্যাপক আন্দোলনের রূপে। তাঁরা নিজেদের মহাযান বৌদ্ধ বলে পরিচয় দিতেন। এই সম্প্রদায় থেকেই দুটি বৌদ্ধ দার্শনিক সম্প্রদায়ের জন্ম হয়– মাধ্যমিক ও যোগাচার।

বৌদ্ধ মাধ্যমিক সম্প্রদায় ঃ এঁরা যে দার্শনিক মতের জন্ম দিয়েছিলেন, তাকে বলা হয় শূন্যবাদ। শূন্যবাদের প্রবক্তা হলেন নাগার্জুন। তিনি মাধ্যমিক নামটি গ্রহণ করেছিলেন প্রাচীন বৌদ্ধমত 'মধ্যমা প্রতিপদ' থেকে, যার আদি অর্থ হল মধ্যম পথ। নৈতিক আচরণের ক্ষেত্রে এই মতে বিশ্বাসীরা মনে করতেন যে, কৃচ্ছসাধন ও আমোদ-আহ্লাদের জীবন কোনওটাই কাঙ্ক্ষিত নয়। মাঝামাঝি পথে চলা উচিত। কিন্তু নাগার্জুন এই ধারণাটির উপর অলৌকিক-অতীন্দ্রিয় ধারণা আরোপ করলেন। তিনি বললেন, এর অর্থ হল বাস্তবতা সম্পর্কে 'এটা আছে' এবং 'এটা নেই', এ রকম নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। বাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। এবং সেই জন্য বাস্তবতা হল অলীক কল্পনা মাত্র, যে কথা উপনিষদে আরেকভাবে বলা হয়েছে।

নাগার্জুনের বক্তব্যের সাথে উপনিষদের চিন্তাবিদ যাজ্ঞবল্ক্য-এর বক্তব্যের অদ্ভুত মিল পাওয়া যায়। যাজ্ঞবল্ক্যও দাবি করেছেন, পরম সত্যকে নির্দিষ্ট করে এটা কিংবা ওটা, এভাবে বলার অর্থ হল অজ্ঞানতায় ডুবে যাওয়া। যেমন, তিনি 'পরম সত্য' সম্পর্কে বলেছেন, ''ইহা অধরা, কারণ একে ধরা যায় না, ইহা অবিনশ্বর, কারণ একে ধ্বংস করা যায় না, ইহা অনাসক্ত কারণ কিছুতেই ইহা আসক্ত হয় না, ইহা অসীম, অবিকম্পিত, অক্ষত।''

নাগার্জুন পরম সত্য সম্পর্কে একই বক্তব্য রেখেছিলেন, ''ইহাকে ধ্বংস করা যায় না, সৃষ্টি করা যায় না, ইহা নিঃশেষিত নয়, চিরন্তন নয়, এক নয়, নয় বহু, অন্তর্গামী নয়, বহির্গামীও নয়।'' এক কথায় আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা দিয়ে পরম সত্যকে বোঝা যাবে না।

নাগার্জুনের দার্শনিক মতবাদের আর এক নাম হল, শূন্যবাদ, অর্থাৎ শূন্য বা অস্তিত্বহীনতা। এর অর্থ পরম সত্য বাস্তব জগতের ছদ্ম প্রকাশকে অতিক্রম করে বুঝতে হবে। অর্থাৎ বাস্তবে আমরা যা দেখি তার বাইরে গিয়ে বুঝতে হবে। তিনি মনে করতেন, পরম সত্যের অবস্থান মানুষের চেতনার ঊর্ধ্বে। যদিও এই সত্যের অবস্থান মানুষের সাধারণ চেতনার বাইরে তবু একে এক ধরনের অলৌকিক সচেতনতার দ্বারা বোঝা সম্ভব, যাকে তিনি নাম দিয়েছিলেন প্রজ্ঞা-পারমিতা বা অতীন্দ্রিয় সর্বোচ্চ জ্ঞান। এটা অর্জন করার অর্থ হল, কল্পিত বস্তুজগত থেকে মুক্তি বা নির্বাণ লাভ।

যোগাচার দর্শন বা বিজ্ঞানবাদ ঃ মহাযান বৌদ্ধদের এই সম্প্রদায় নিজেদেরকে যোগাচার্য হিসাবে পরিচয় দিতেন। কারণ তাঁরা দার্শনিক প্রজ্ঞা অর্জনের জন্য বহির্জগৎ থেকে চেতনাকে সরিয়ে নেওয়ার উপায় হিসাবে যোগ বা ধ্যানের আশ্রয় নিয়েছিলেন।

কিন্তু তাঁদের দার্শনিক মতবাদ সম্পর্কে আরও পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়, বিজ্ঞান-বাদ বা বিজ্ঞপ্তি-মাত্রতা-বাদ নাম থেকে। বিজ্ঞান বা বিজ্ঞপ্তি বলতে মন বা চেতনাকে বোঝানো হয়েছে। এই বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মতে মন হল চেতনার স্রোত বা আরও নির্দিষ্ট করে বললে ক্ষণস্থায়ী চেতনার প্রবাহ। বিজ্ঞানবাদীদের মতে এই অর্থে মনই হল সত্য বা কেবলমাত্র চেতনাই হল সত্য। স্বাভাবিকভাবেই এই দর্শনের মূল ঝোঁক হল বস্তুজগতকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করার দিকে।

বিষয়টাকে তাঁরা আরেকভাবে রেখেছেন। তাঁদের মতে ভাব বা চেতনা কোনও বস্তুগত উপাদানের সাহায্য ছাড়াই তাদের নিজস্ব শক্তিতেই অবস্থান করে। তাই এই দর্শনকে নিরালম্বনবাদও বলা হয়ে থাকে। এর অর্থ হল, ভাব বা

চেতনার জন্য কোনও বস্তুগত অবলম্বনের প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ ভাব বা চেতনা হল স্বয়ম্ভু। যেহেতু ভাবই হল একমাত্র বাস্তবতা, তাই সাধারণভাবে যে বস্তুজগতকে আমরা দেখি তা অবাস্তব বা ভ্রমাত্মক।

অদ্বৈত বেদান্ত ঃ অষ্টম শতাব্দীতে আমরা উপনিষদীয় ভাববাদের উত্থান হতে দেখেছি। কিন্তু তাঁরা উপনিষদ থেকে সরাসরি যাত্রা শুরু করেন নি। মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের দার্শনিকরা উপনিষদের চিন্তাকে ভিত্তি করে ভাববাদী দর্শনকে যতদূর পর্যন্ত পুষ্ট করেছিলেন, সেখান থেকেই উপনিষদীয় ভাববাদ তার যাত্রা শুরু করেছিল। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে তা দানা বাঁধতে থাকে এবং অদ্বৈত বেদান্তের রূপে তার আত্মপ্রকাশ ঘটে। তাই অদ্বৈত বেদান্তের দ্বৈত উৎস রয়েছে।

দ্বৈত উৎসের বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা করে বলা যাক। বাস্তবে উপনিষদে ভাববাদী চিন্তা প্রাথমিক এবং সরলীকৃত রূপে ছিল, ভাববাদী দর্শনের উপাদান হিসেবে ছিল। কিন্তু একটা সুললিত ও সুসংবদ্ধ দার্শনিক মতবাদ হিসেবে ছিল না। মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের দার্শনিকরা ঐতিহাসিকভাবে প্রথম এই উপাদানগুলিকে ভিত্তি করে সুসংবদ্ধ দার্শনিক মতবাদের জন্ম দিয়েছিলেন। অদ্বৈত বেদান্তবাদীরা এই মতবাদ মহাযান বৌদ্ধদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন, যদিও হুবহু কপি করে নয়। অদ্বৈত বেদান্তবাদীরা তাদের মতো করে কোথাও বেশি জোর দিয়েছেন, কোথাও নতুন পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। সেই অর্থে মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায় যেমন উপনিষদের কাছে ঋণী, তেমনি অদ্বৈত বেদন্তবাদীরা মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কাছে ঋণী। কিন্তু নিজেদের গোষ্ঠী মানসিকতার জন্য কেউই কারোর কাছে ঋণ স্বীকারে প্রস্তুত নয়।

অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনের প্রথম প্রকৃত প্রতিনিধি হলেন গৌড়পাদ। তবে এই দর্শনের সবচেয়ে প্রভাবশালী দার্শনিক ছিলেন শংকরাচার্য। তিনি হয় গৌড়পাদের শিষ্য বা তাঁর শিষ্যের শিষ্য। অষ্টম শতকের পরে অদ্বৈত বেদান্তই সবচেয়ে প্রভাবশালী দর্শন হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। কারণ প্রথমত, এই সময় মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে দর্শন চর্চার আকর্ষণ ভীষণভাবে কমে যায়। দ্বিতীয়ত, শংকরাচার্য অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় তাঁর দার্শনিক মতকে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তৃতীয়ত, তার কয়েক শতাব্দী আগেই এদেশে সামন্তী শাসনের সূচনা হয়েছে। আমরা জানি সামন্তী শাসকেরা সবচেয়ে বলিষ্ঠভাবে ভাববাদী দর্শনের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল। তাই শংকরাচার্য যে তাদের কাছ থেকে সব ধরনের সাহায্য পাবেন, তাতে আর আশ্চর্য কী?

শংকরাচার্য তাঁর দার্শনিক মত প্রচারের সময় শ্রুতি ও স্মৃতির উপর নির্ভর করার কথা বলেছেন, যুক্তিকে সম্পূর্ণ পরিহার করার কথা বলেছেন। এখানে শ্রুতি বলতে বেদ এবং স্মৃতি বলতে বিধিবদ্ধ আইনের কথা বলা হয়েছে, যে আইন প্রণয়ন করেছিলেন মনু। তাঁর দার্শনিক মতবাদকে বলা হয়, মায়াবাদ। যার মূল কথা হল, আমরা আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় যে জগৎকে দেখি, তার কোনও বাস্তব অস্তিত্ব নেই। আসলে সবই মায়া বা ভ্রম। যেমন, রজ্জুতে সর্পভ্রম। বা স্বপ্নে আমরা যা দেখি, তার কোনও বাস্তব অস্তিত্ব নেই। তিনি বলেছেন, দার্শনিকেরা যে খাবার খায়, বস্তুজগতের অন্যান্য জিনিসের মতো তারও কোনও বাস্তব অস্তিত্ব নেই। কিন্তু সমস্যা হল, খাবার খেলে যে খিদে মেটে, সেটা তো অস্বীকার করার উপায় নেই। তা হলে একে ভাববাদীরা কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন? বৌদ্ধ ভাববাদীদের মতোই শংকরাচার্যও দু'ধরনের সত্যের ধারণা দিয়েছেন, ব্যবহারিক সত্য বা সম্বৃতি সত্য এবং পরম সত্য। অর্থাৎ ব্যবহারিক জীবনে এক ধরনের সত্যের অস্তিত্ব আছে, কিন্তু সেটা প্রকৃত সত্য নয়। প্রকৃত সত্য হল আত্মণ বা ব্রহ্মণ। অর্থাৎ পরম সত্য।

সংক্ষেপে ভারতীয় ভাববাদের বিবর্তনের ক্রমপর্যায় নিম্নলিখিত রূপে বলা যায়। উপনিষদে শুধু ঘোষণা করা হয়েছিল যে, একমাত্র আত্মা বা চৈতন্যই সত্য, আর কিছু নয়। পরবর্তীকালে ভাববাদী দার্শনিকদের উপর এই বক্তব্যকে প্রমাণ করার দায়িত্ব এসে পড়ে। প্রথমে মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের দার্শনিকেরা এবং তারপরে অদ্বৈত বেদান্তবাদীরা এই চেষ্টা করেন। এই দুই সম্প্রদায়ের ভাববাদী দার্শনিকেরা যে পদ্ধতিতে এই বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন, তাতে পার্থক্য ছিল মূলত পরিভাষায়। শূন্যবাদীদের কাছে বস্তু জগতের কোনও বাস্তব অস্তিত্ব নেই, সবই শূন্য বা অস্তিত্বহীন। বিজ্ঞানবাদীদের কাছে বস্তু জগৎ হল অলীক বা নিছক কল্পনা, যাকে তারা বলেছেন কল্প বা বিকল্প। আর অদ্বৈত বেদান্তবাদীরা দাবি করেন যে, এই বস্তু জগতকে যে আমরা দৃশ্যমান দেখি, তা আমাদের অজ্ঞানতার ফল, যাকে তারা বলেছেন অবিদ্যা বা মায়া। অর্থাৎ সমস্ত ভাববাদীদের বক্তব্যের পার্থক্য শুধু পরিভাষায়, কিন্তু মূল বক্তব্য একই, বস্তু জগতের কোনও অস্তিত্ব নেই।

উপসংহার

আমরা অতি সংক্ষেপেই ভারতীয় দর্শনের বিকাশের ইতিহাসকে একটি প্রবন্ধের পরিসরে রাখার চেষ্টা করেছি। প্রাচীন ভারতের দর্শন চিন্তার ইতিহাস দীর্ঘ এবং বৈচিত্র্যময়। এখানে যেমন ভাববাদী দর্শনের বিকাশ হয়েছে, তেমনি

বস্তুবাদী দর্শনেরও বিকাশ হয়েছে। কিন্তু খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পরে শংকরাচার্যের মায়াবাদ তৎকালীন শাসক শ্রেণির ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল। ফলে, সারা দেশজুড়ে এই দর্শনের প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে সেটা সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। তাই, এই সময় থেকে বস্তুবাদী দর্শনগুলোকেও ভাববাদী প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হয়েছে। ফলে, আদি সাংখ্য যেখানে বস্তুবাদকে প্রতিফলিত করেছে, সেখানে সাংখ্যসূত্রের মধ্যে যে মত প্রতিফলিত হয়েছে তা বেদান্তেরই অনুরূপ। সে জন্যই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সাংখ্য ও বেদান্তকে এক পংক্তিতে ফেলেছিলেন। রেনেসাঁস পরবর্তীকালে প্রাচীন ভারতে দর্শন চর্চার উপর বহু দেশি-বিদেশি গবেষক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করেছেন, যার ভিত্তিতে বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের পুনর্মূল্যায়ন হয়েছে এবং বস্তুনিষ্ঠভাবে এ দেশে দর্শনচর্চার ইতিহাস রচিত হয়েছে। আমরা এই প্রবন্ধে তার উপর ভিত্তি করেই আলোচনা করেছি। ◘